একটি গোলাপের জন্য

লাল জুলাইয়ের গল্প

সাব্বির জাদিদ

ঐতিহ্য

লাঠি
৩

সূচি

লাঠি ১১
রিকশা কাহিনি ২১
নিহত গোলাপ ৩২
একটি সিন্দুক দুইটি ফেরাউন ৪০
আলো ৪৬
সানগ্লাস ৫৩
অভিমান ৬১
একটি গোলাপের জন্য ৭০
আগুনের চিতা ৭৯
পলু ৮৬

লেখকের কথা

চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশ তো বটেই, পৃথিবীর ইতিহাসেই এক বিরল ঘটনা। এই অভ্যুত্থান এদেশের মাটিতে এমন সব বিস্ময়কর গল্পের জন্ম দিয়েছে, যার কাছে হার মেনেছে সকল কল্পনা। বাংলাভাষার ক্ষুদ্র এক লেখক হিসেবে ছাত্র-জনতার অভাবনীয় সাহস ও আত্মত্যাগ তাড়িত করেছে আমাকেও। এই বইয়ের গল্পগুলো সেই তাড়িত হৃদয়েরই আর্তচিৎকার। চব্বিশের আগস্ট থেকে নভেম্বর— এই চারমাসে লেখা হয়েছে গল্পগুলো। প্রতিটি গল্পই প্রথম শ্রেণির জাতীয় দৈনিক ও সাহিত্য কাগজে প্রাকাশিত। কেয়ামতের আগেই কীভাবে আমরা আরেকটি কেয়ামতের মুখোমুখি হয়েছিলাম, তার কিছু চিহ্ন পাওয়া যাবে গল্পগুলোতে।

সাব্বির জাদিদ
আফতাবনগর, ঢাকা
১ ডিসেম্বর, ২০২৪

লাঠি

প্রতিদিন ঘুম থেকে ওঠার পর সবার আগে লাঠির কথা মনে পড়ে আবদুস সালামের। না, তিনি ছাত্র ঠ্যাঙানো রাগী কোনো মাস্টার না, যে, ছাত্র ঠ্যাঙানোর জন্য লাঠির কথা মনে পড়বে। বরং প্রত্যেক সকালে লাঠিতে ভর দিয়ে তিনি বিছানা থেকে দাঁড়ান, বাথরুমে যান, কখনো বারান্দায় গিয়ে দৃষ্টি ছড়ান। তার নড়বড়ে শরীরকে সোজা রাখতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখে লাঠি। এ কারণেই, প্রতি সকালে, তার লাঠির কথা মনে পড়ে। সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে বিজ্ঞানের কত নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কৃত হচ্ছে। অথচ আবদুস সালামের মনে হয়, বৃদ্ধের হাতের লাঠি বিজ্ঞানের সেরা আবিষ্কার। অবশ্য সরাসরি লাঠিকে তিনি সেরা আবিষ্কার বলেন না। লাঠি তো এক নিষ্প্রাণ কাষ্ঠখণ্ড। এর সাথে বিজ্ঞানের কোনো সম্পর্কই নেই। তিনি বরং লাঠির ব্যবহারকে বিজ্ঞানের সেরা আবিষ্কার বলেন। একজন নড়বড়ে বৃদ্ধ, যিনি একাকী পথ চলতে পারেন না, একটি কাঠের দণ্ড হাতে ধরিয়ে দিলেই তিনি ভর রক্ষা করতে পারবেন, এই ভাবনাটাই যদি মানুষের মাথায় না আসত! কোনো কোনো ভ্যাপসা গরমের দুপুরে, একটুখানি ঠান্ডা বাতাসের পরশ পেতে আবদুস সালাম যখন চারতলার বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ান, হঠাৎ হঠাৎ তার সেই মহা উপকারী মানুষটার কথা মনে পড়ে, যার মাথায় সর্বপ্রথম লাঠির ভাবনা এসেছিল। ইতিহাসে কি তার নাম সংরক্ষিত আছে? পাওয়া যায় কি তার দেশ-কাল-পরিচয়ের সন্ধান?

আবদুস সালাম মাঝে মাঝে নিজের মনেই হাসেন। চিন্তার কত তুচ্ছ পোকা তার মাথায় হাঁটাচলা করে! ছোটাছুটি করে ভাবনার কত পতঙ্গ! আসলে মানুষকে সৃষ্টিই করা হয়েছে চঞ্চলতা দিয়ে। একটি শিশু, ঘুমের

সময়টুকু ছাড়া, সারাক্ষণ সে অকারণ ছোটাছুটি করে। বড় হওয়ার পরও শৈশবের স্বভাবটা সে ছাড়তে পারে না। দিনে দিনে তার দৈহিক চঞ্চলতা কমে বটে, কিন্তু মস্তিষ্কের চঞ্চলতা থামে না একমুহূর্তের জন্যও। সারাক্ষণই সে কিছু না কিছু নিয়ে ভাবছে। বিশেষত আবদুস সালামের মতো যাদের পৃথিবী এক কামরায় বদ্ধ, তাদের মস্তিষ্ক দখিনা হাওয়ায় খোলা কপাটের মতোই উন্মুক্ত। আর এ কারণেই আবদুস সালামের এই লাঠি-বিষয়ক গবেষণা।

তিন কামরার ফ্ল্যাটের বাইরে আবদুস সালামের আর কোনো পৃথিবী নেই। নিজের ঘরের বারান্দায় দাঁড়ালে সামনে এক শীর্ণ খাল। বর্ষায় খানিকটা প্রাণ ফিরলেও সারা বছর দুর্গন্ধ ছড়ায়। ঢাকার মাঝারি অভিজাতদের বসবাস খালের দুকূল জুড়ে বেড়ে ওঠা জনপদে। ওপাশে আফতাবনগর, এপাশে বনশ্রী। আবদুস সালাম বনশ্রী অংশে বসে খাল এবং খালের দুপাশের জীবন দেখেন। খালের ওপর একটি বাঁশের সাঁকো জুড়ে দিয়েছে দুই পারের জীবন। দিনভর কত মানুষ যে আসা-যাওয়া করে। মাঝে মাঝে বৃদ্ধ মানুষকেও সাঁকো পার হতে দেখেন আবদুস সালাম। বাঁশের সাঁকোয় বৃদ্ধ মানুষগুলো শিশুদের মতো কাঁপা কাঁপা পা ফেলে। তা দেখে শঙ্কিত হয়ে ওঠেন আবদুস সালাম। যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যায়! যদি মাথা ঘুরে পড়ে যায় মানুষটা! মাঝে মাঝে আবদুস সালামেরও বের হতে ইচ্ছে করে। ওই খালের কিনারায়, হোক তার পানি দুর্গন্ধময়, লাঠিতে ভর দিয়ে একটু কি দাঁড়ানো যায় না? ওই কলার পাতা, যা কি না মায়ের আঁচলের মতো ঝুঁকে আছে রাস্তার দিকে, একটু কি ছুঁয়ে দেখা যায় না? কিংবা ওই ফুটপাত, আইডিয়ালের সামনে দিয়ে যেটা চলে গেছে রামপুরা টিভি সেন্টারের দিকে, তার টলায়মান পা কি ওই কংক্রিটের ফুটপাতে ছাপ রাখতে পারে না? শত ইচ্ছার পরও বেরোতে সাহস হয় না আবদুস সালামের। তার মতো বৃদ্ধকে আগলে রাখবে, এমন যত্নের হাত কি আছে এই শহরের! তার ওপর গোটা শহর জুড়ে যা চলছে, তৈমুরকে বেরোনোর কথা বললে রক্তচোখে তেড়ে আসবে নির্ঘাত।

তৈমুর আবদুস সালামের ছেলে। শেষ বয়সে ছেলের বাসায় আশ্রয় হয়েছে আবদুস সালামের। ছেলেকে তিনি যেভাবে দেখতে চেয়েছিলেন, আবদুস সালামের মনে হয়, ছেলে ঠিক সেইভাবে বড় হয়নি। তিনি পুরনো দিনের মানুষ। বৈষয়িক ব্যাপার বোঝেন কম। তারপরও তৈমুরের

বেতনের সাথে এই বাসার আসবাব ও বিলাসিতার হিসাব মেলাতে পারেন না। অথচ ছেলেকে তিনি একজন সৎ নাগরিক হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন। চেষ্টাও কি করেননি? করেছেন। কিন্তু ছেলে তার স্বপ্ন-পথে বড় হয়নি। প্রতিটি মানুষের জীবনেই পরাজয়ের কিছু ঘটনা থাকে। আবদুস সালামের পরাজয়ের চিহ্ন তৈমুর। এমন ছেলের কাছে আহ্লাদ করে বলা যায় না, বাবা, আমাকে একটু বাইরে নিয়ে যাবে? ঘরের মধ্যে দম বন্ধ দম বন্ধ লাগে। বেশিক্ষণ থাকব না, এই ধরো দশ মিনিট। তোমার সময় নষ্ট হবে না বেশি।

নাতিটা অবশ্য হয়েছে আবদুস সালামের মতো। যতক্ষণ সে বাসায় থাকে, উৎফুল্ল থাকেন আবদুস সালাম। কেনইবা থাকবেন না! মনের মতো একটা মানুষ, যতই অসম বয়সি হোক, যতক্ষণ পাশে থাকে, ততক্ষণ প্রশান্তি। আরিয়ানের নরম মন। বৃষ্টির দিনে খালপারের নিমের ডালে যখন জবুথবু হয়ে ভেজে কয়েকটি কাক, মন খারাপ করে আরিয়ান। আফসোস করে বলে, ওদের জন্য যদি একটা ঘর বানাতে পারতাম! প্রায় দিনই সে টিফিনের টাকা ফকিরকে দিয়ে আসে। বাসায় অবশ্য বলার সাহস পায় না। দাদুর কাছে বলে আর হতাশা ব্যক্ত করে, এই দেশের মানুষ এত গরিব কেন!

একদিন আরিয়ানের কলেজ অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ হয়ে গেলে নেচে ওঠে আবদুস সালামের মন। বন্ধের দিনগুলোতে এই বদ্ধ বাসায় নাতিকে তার সবসময় কাছে পাওয়া হবে। কিন্তু যখন শোনেন, কলেজ বন্ধের পেছনে রয়েছে ছাত্র-আন্দোলনের অস্থিরতা, তিনিও অস্থির হয়ে ওঠেন। এদেশের শিক্ষাঙ্গনের কি মুক্তি নেই সংঘাত থেকে! একলা ঘরে তিনি এক জগৎ-বিচ্ছিন্ন মানুষ। দেশ এবং দেশের বাইরে কোথায় কী ঘটে চলেছে, কিচ্ছু জানতে পারেন না। তার কেবলই মনে হয়, পৃথিবীর কোনো এক প্রান্তে কোনো এক নিষ্পেষিত দেশ যদি স্বাধীনও হয়ে যায়, সেটাও তিনি জানতে পারবেন না। অথচ স্বাধীনতার মতো দ্বিতীয় কোনো সুখের জন্ম হয়নি পৃথিবীতে। একারণেই কি তিনি এই ছোট্ট দেশের স্বাধীনতার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের অংশ হয়েছিলেন? হয়তো তাই। অথবা সেটা ছিল শুধুই ঘোর। সময়ের এক অনিবার্য ঘোর তার মতো নির্বিবাদী মানুষকেও উড়ন্ত যোদ্ধা করে তুলেছিল। ভাবতে অবাক লাগে, যে চঞ্চল শরীর একদা ছুটে বেড়িয়েছে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, সেই তিনি আজ এক অকেজো

আসবাবপত্র, ঘরের জায়গা নষ্ট করাই যার একমাত্র কাজ। অবশ্য মাঝে মাঝে একটু-আধটু দুনিয়ার খবর যে পান না, তা বলা যাবে না। সেটাও ওই আরিয়ানের জানালা দিয়ে। তাই বলা যায়, এই একলা জীবনে আরিয়ানই তার অনিয়মিত সংবাদপত্র।

আমরা দেখি, এক আশ্চর্য সকালে, একাদশ শ্রেণির সদ্য গোঁফের আভাস ফোটা আরিয়ান শুধু সংবাদপত্রই হয়ে ওঠে না, সে বরং হয়ে ওঠে এক দারুণ সংবাদ বিশ্লেষক। এই সংবাদ বিশ্লেষকের কাছ থেকে আবদুস সালাম জানতে পারেন, রক্তের নদী হয়ে গেছে ঢাকা শহর। সেই নদী ডাকছে আরিয়ানকেও।

এত রক্ত! কাদের? আবদুস সালামের বুক ধড়ফড় করে ওঠে।

স্টুডেন্টদের! পুলিশ গুলি করে মেরে ফেলছে আমার ভাইদের।

ধীরে ধীরে সব জানতে পারেন আবদুস সালাম। কোটা সংস্কার আন্দোলনে মেতেছে দেশের সব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী। মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের জন্য বরাদ্দকৃত ৩০% কোটার সংস্কার চায় তারা। এই অস্বাভাবিক কোটার চাপে প্রকৃত মেধাবীরা যে কোণঠাসা হচ্ছে। আর এই যৌক্তিক আন্দোলন দমাতেই মারমুখী হয়েছে পুলিশ। গতকালই মারা গেছে পঁয়ষট্টিজন শিক্ষার্থী। শিউরে ওঠেন আবদুস সালাম। স্বাধীনতার পর এই দেশে একদিনে এতগুলো নিরীহ প্রাণ কি ঝরেছে কখনো! তিনি বিড়বিড় করে এক থেকে পঁয়ষট্টি পর্যন্ত গোনেন। অনেক সময় লাগে গুনতে। এবার তিনি মনে মনে পঁয়ষট্টিটি লাশ শুইয়ে দেন সারি সারি। তারপর লাঠিতে ভর দিয়ে সেই সারি সারি লাশ অতিক্রম করেন। সারি শেষ হয় না, তার আগেই তিনি হাঁপিয়ে ওঠেন। বিশ্রাম নেওয়ার জন্য বসে পড়েন মাটিতে আর ক্ষিপ্র কণ্ঠে বলেন, ওরা একদিনে এতগুলো মানুষ মেরে ফেলল!

যে কোটা নিয়ে এত রক্তপাত, সেই কোটা এবার বুকের ভেতর কুঠারঘাত করতে থাকে আবদুস সালামের। নিজে তিনি সনদপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা। ভাতাটুকুর বাইরে রাষ্ট্রের আর কোনো সুবিধা তিনি নেননি। কিন্তু এই পবিত্র সনদের চূড়ান্ত অপব্যবহার করেছে ছেলে তৈমুর। মুক্তিযোদ্ধার সন্তান হিসেবে সরকারি চাকরি তো লুফে নিয়েছেই, প্রতিপত্তির প্রবল বলয়ও তৈরি করেছে নিজের চারপাশে। সারাজীবনের সঞ্চয় দিয়ে আবদুস সালাম গ্রামে একখানা নিরীহ গোছের টিনের বাড়ি

করতে পেরেছেন। আর তৈমুর ঢাকার তিন তিনটি ফ্ল্যাটের মালিক। আরো কয় জায়গায় যে জমি কিনেছে, হিসাব নেই। দিন যত যাচ্ছে, চাকরির পাশাপাশি তৈমুরের ব্যবসা ডালপালা মেলছে। প্রায়ই তার বিদেশ সফর থাকে। টিভিতেও তার মুখ দেখা গেছে বার কয়েক। এইসব বৈভবের ধকল নিতে পারেন না আবদুস সালাম। তার কেবলই মনে হয়, এই বিত্তের কোনায় কোনায় ছড়িয়ে আছে অসততা আর মানুষের চিৎকার। তাই তো তিনি দিনে দিনে নিজের ভেতর আরো বেশি গুটিয়ে গেছেন। এরই মাঝে একদিন আরিয়ান জেদ করতে থাকে বিক্ষোভে যাওয়ার। বিনিময়ে আরিয়ানকে আটক থাকতে হয় ঘরে। আবদুস সালাম ডাইনিং থেকে তৈমুরের গর্জন শুনতে পান : উনি কোটা বিরোধী আন্দোলনে যাবে। অথচ এই কোটা দিয়েই সে অনেক বড় পজিশনে যেতে পারবে। গাধা কোথাকার! আমার ঘরে এমন গাধার জন্ম হলো কীভাবে!

বাবার মতোই প্রতিচিৎকারে ফেটে পড়ে আরিয়ান— কোনো পজিশনে যেতে হলে আমি নিজের যোগ্যতায় যাব। আমার কোনো কোটা ফোটার প্রয়োজন নেই। এবার আমাকে ছেড়ে দাও। না হলে দরজা ভেঙে ফেলব।

থাপ্পড় খাবে আরিয়ান। তুমি হয়তো জানো না, তোমাদের এই আন্দোলনের ভেতর মৌলবাদীগোষ্ঠী ঢুকে গেছে। এরা তোমাদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাচ্ছে। এরা সরকার পতনের পাঁয়তারা করছে। আর সরকার পড়ে গেলে কী হবে জানো? তোমার বাবাকে আর ব্যবসা করে খেতে হবে না। তোমার এই রকমারি পোশাক, বাহারি খাবার, গাড়িতে ঘোরা, স্কুলের বেতন সব বন্ধ হয়ে যাবে তখন।

সরকার পড়লে পড়বে। এই সরকার স্বৈরাচার। এই সরকার দুর্নীতিগ্রস্ত। এরা মানুষের ভোটের অধিকার হরণ করেছে। এরা দেশের টাকা বিদেশে পাচার করেছে। এদের পতনই হওয়া উচিত।

চুপ! একদম চুপ! আর একটা কথা বললে বাড়ি থেকে বের করে দেবো।

আড়ালে থেকেও তৈমুরের চেহারাটা স্পষ্ট দেখতে পান আবদুস সালাম। এই রকম রাগে তৈমুরের চেহারা রক্তিম হয়ে ওঠে। ঠোঁট ও চোখের পাতায় কাঁপন ওঠে তিরতির। বউমাটা কোথায়! সে কেন তৈমুরকে সামলাচ্ছে না। আবদুস সালাম ভয়ে নিজের বিছানায় জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকেন। আরিয়ান আজ তাকে হতভম্ব করে দিয়েছে। ওইটুকুন ছেলে, সে

কি না রাজনীতিবিদদের মতো ভাষণ দিচ্ছে বাবার মুখের ওপর। ওরা গণতন্ত্র হরণকারী সরকারকে হটাতে চায়! না, আরিয়ান তার মনের মতোই হয়েছে। তিনি আরিয়ানকে ভুল জানতেন। ভাবতেন, রাজনীতিবিমুখ, স্রোতে গা ভাসানো এক শহুরে বালক আরিয়ান। অথচ সেই আরিয়ানের মুখে আজ অগ্নিবাণ। ছেলেটার জন্য মায়া হয় আবদুস সালামের। আকাঙ্ক্ষা থাকার পরও পরিবারের চাপে যুদ্ধে না যাওয়ার মতো বেদনা কি আছে কিছুতে! নিজের কৈশোরের কথা মনে পড়ে আবদুস সালামের। একাত্তরের সেই উত্তাল দিনে পারিবারিক বাধা ছাড়াই তিনি ঘর ছাড়তে পেরেছিলেন। এখনকার শহুরে জীবনের মতো তখনকার জীবন এমন বন্দি ছিল না। চাইলেও কাউকে আটকে রাখা যেত না ঘরে। তারপরও কাউকে না বলে, মায়ের উদ্দেশে এক চিঠি লিখে, আবদুস সালাম পাড়ি জমিয়েছিলেন নিরুদ্দেশে। যুদ্ধে যাওয়ার সিদ্ধান্ত যদি না নিতেন সেদিন, হয়তো জীবনভর তাকে গ্লানির আগুনে পুড়তে হতো। আরিয়ানের সামনেও আজ সময়ের দায় মেটানোর মুহূর্ত এসেছে। সে যদি আজ মাঠে না নামে, গ্লানি কি ওকে জীবনভর পোড়াবে না! একবার মনে হয়, গোপনে দরজা খুলে দেবেন। কিন্তু তৈমুরের রাগী মুখটা কল্পনা করে সাহস হয় না। তিনি বরং লাঠিতে ঠকঠক শব্দ তুলে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ান। রামপুরা-ডেমরার রাস্তাটা মৃত সাপের মতো চিত হয়ে পড়ে আছে। গাড়িশূন্য। সামান্য সময়ের বিরতি দিয়ে বিজিবির দুটো গাড়ি কর্কশ শব্দ তুলে বেরিয়ে গেল। দূরে কোথাও অ্যাম্বুলেন্সের হুইসেল বাজছে। ঠিক কবে তিনি এই রকম সুনসান এবং সন্ত্রস্ত রাস্তা দেখেছেন, মনে করতে পারলেন না। হঠাৎ আকাশ কাঁপিয়ে বনশ্রীর মাথার ওপর চক্কর কাটতে লাগল এক হেলিকপ্টার। এই অসময়ে, হেলিকপ্টার কেন ওড়ে, বুঝতে পারলেন না আবদুস সালাম। মাঝে মাঝে বিভিন্ন স্থাপনায় আগুন লাগার খবর পান তিনি। সে সময় আগুন নেভাতে হেলিকপ্টার থেকে নাকি পানি দেওয়া হয়। কোথাও কি তবে আগুন লেগেছে? এই ডামাডোলের ভেতর কোথায় আবার আগুন লাগল!

হেলিকপ্টারের শব্দ শুনেই বারান্দায় ছুটে আসে আরিয়ানের মা, আবদুস সালামের পুত্রবধূ। 'ভেতরে আসুন ভেতরে আসুন' বলে সে শ্বশুরকে টানতে টানতে ঘরের ভেতর নিয়ে আসে। দ্রুত বন্ধ করে দেয় বাইরের দিককার সকল দরজা-জানালা। হতভম্ব আবদুস সালাম বুঝতে

পারেন না কিছুই। খানিকটা বিরক্তও হন বউমার ওপর। এরই মধ্যে কী এমন ঘটল যে তাকে বারান্দা থেকে সরিয়ে ঘরে বন্দি করতে হবে! আবদুস সালামের চোখে-মুখে ফুটে ওঠে অপ্রসন্নতার ছায়া।

ফারজানা ফিসফিস করে বলে, দুঃখিত বাবা, এইভাবে আপনাকে টেনে আনতে হলো। এখন থেকে আপনাকে আর ব্যালকনিতে যাওয়া চলবে না।

কেন, আরিয়ানের পর আমাকেও বন্দি করতে চাও নাকি? ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন বুড়ো মানুষটা।

ফারজানা যথা সম্ভব চেষ্টা করে গলার স্বর কোমল রাখার : বন্দি করব কেন! আমরা চাই আপনি নিরাপদ থাকুন। গত দুইদিনে হেলিকপ্টারের এলোপাথাড়ি গুলিতে বেশ কয়েকজন মারা গেছে। তারা কেউ ঘরের মধ্যে ছিল, কেউ বারান্দায়। এদের মধ্যে শিশুও আছে। আল্লাহ না করুন... কথা শেষ করে না ফারজানা। নীরবতার শব্দ দিয়ে সে ভরাট করতে চায় অপ্রীতির শূন্যস্থান।

স্তম্ভিত হয়ে যান আবদুস সালাম। হেলিকপ্টার থেকে গুলি! দেশে কি যুদ্ধ চলছে? ওরা কি বহিঃশত্রু! তিনি থপ করে বসে পড়েন বিছানার ওপর। কতক্ষণ মুখে কোনো কথাই বলতে পারেন না।

টেনশন কইরেন না। সব দেশেই টুকটাক এমন ঘটনা ঘটে। দুদিন পর সব ঠিক হয়ে যাবে। তখন আপনাকে নিয়ে ঘুরতে যাব। আপনি কি পানি খাবেন? আপনি যদি আরিয়ানকে ঘরে রাখতে পারেন তবে ওকে ছাড়তে পারি। আমার বিশ্বাস, ও আপনার কথা শুনবে। দেখতেই তো পাচ্ছেন, ঘরেও মানুষ নিরাপদ না। মা হয়ে এর মধ্যে ওকে কীভাবে মিছিলে পাঠাই। আপনি ওকে বোঝান প্লিজ। শ্বশুরকে একলা রেখে চলে যায় ফারজানা। একটু পর পানির গ্লাস হাতে আরিয়ানকে আসতে দেখা যায় দাদুর রুমে। দুজন কতক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে খাটের দুই প্রান্তে। তারপর গ্লাসের পানিটুকু খেয়ে কথা শুরু করেন আবদুস সালাম। তিনি চেয়েছিলেন, স্বাভাবিক সময়ের সুখের কোনো প্রসঙ্গ তুলবেন। কিন্তু ঘুরেফিরে কথারা ওই ছাত্র আন্দোলনের গায়ে লতিয়ে ওঠে। আবদুস সালাম অনেক কথাই জানতে পারেন নাতির কাছ থেকে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় যে বিষয়টি, তা হলো, এই আন্দোলনে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা। যাদেরকে সবাই ব্রয়লার মুরগি বলে

হাসাহাসি করে, সেই তারাই বুলেটের সামনে বুক পাতছে প্রতিযোগিতা করে। অনেক বুদ্ধিজীবী বলছে, একাত্তরের পর এরাই সবচেয়ে সাহসী প্রজন্ম। চোখ ভিজে ওঠে আবদুস সালামের। বুকের ভেতর পদ্মার ঢেউ উথালপাথাল করে। এই ছেলেগুলোর ভেতর নিজের কিশোর জীবনের ছায়া দেখতে পান তিনি। তিনি আপ্লুত কণ্ঠে বলেন, নেটে ওদের দেখা যায় না? একটু দেখাবা?

নেট তো বন্ধ। ওরা নেট বন্ধ করে গণহত্যা চালাচ্ছে। যেন দেশের এই নির্মমতা বাইরের পৃথিবী জানতে না পারে।

কী বীভৎস! নাতিকে বুকের মধ্যে আগলে নেন আবদুস সালাম। ওর পল্লবিত চুলে আঙুল চালাতে চালাতে বলেন, আমরা একাত্তরে যুদ্ধ করেছিলাম, তখন দুই বাহিনীর হাতেই অস্ত্র ছিল। কিন্তু তোমাদের হাতে তো কোনো অস্ত্র নেই। নিরস্ত্র তোমরা কীভাবে লড়বে অস্ত্রের বিরুদ্ধে! এর মধ্যে তোমাকে কীভাবে মিছিলে যাওয়ার অনুমতি দিই!

দাদু, আমাদের বুকটাই তো অস্ত্র। ওরা কতজনকে মারবে! তুমি আবু সাঈদের গল্প শোনোনি? আবু সাঈদ আমাদের প্রজন্মের এক বিস্ময়কর যোদ্ধা। এরপর আরিয়ান নক্ষত্রের মতো জ্বলজ্বলে চোখে আবু সাঈদের দুর্নিবার সাহস ও অসামান্য বীরত্বের গল্প শোনায় দাদুকে।

সেই রাতে ঘুমাতে পারেন না আবদুস সালাম। স্বপ্নের মধ্যে বারবার হাজির হয় আবু সাঈদের মুখ। মাথার ভেতর ভোঁ-ভোঁ করে উড়তে থাকে হেলিকপ্টার। ঘুমের ভেতরও শুনতে পান গুলির আওয়াজ। এক অচেনা কিশোর, যার মাথা দিয়ে গলগল করে রক্ত পড়ছে, অট্টহাসি দিয়ে ঘুরতে থাকে মশারির চারপাশে আর বলতে থাকে, ওহে বৃদ্ধ, এই স্বাধীনতার জন্যই কি রক্ত দিয়েছিলে একাত্তরে? আবদুস সালামের মনে হয়, এ তো সেই কিশোর, যার বেদনাদায়ক পরিণতি নিয়ে সেদিন আলাপ করছিল তৈমুর ও ফারজানা। কিশোরটি মেরাদিয়ার এক নির্মাণাধীন বিল্ডিংয়ের জানালার কার্নিশে প্রাণভয়ে পালিয়েছিল। কিন্তু চারতলার জানালার কার্নিশ তাকে গুলি থেকে রক্ষা করতে পারেনি।

ধড়ফড় করে উঠে বসেন আবদুস সালাম। লাঠিটা হাতড়ে খুঁজে মশারি থেকে বের হয়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ান। এই চিলতে বারান্দা আবদুস সালামের অনেক নির্ঘুম রাতের সাক্ষী। কিন্তু আজকের রাতটা অন্য রাতের মতো নয়। অন্যান্য রাতগুলোতে আবদুস সালাম নিশাচর

পাখির ডাক শুনতেন। সরসর শব্দ তুলে খালের ওপর দিয়ে উড়ে যেতে দেখতেন কোনো বাদুড়কে। আইল্যান্ডের ওপর অলস ভঙ্গিতে আড়মোড়া ভাঙতে দেখতেন একটি কুকুরকে। কিন্তু আজ পাখি ডাকছে না। কুকুর আড়মোড়া ভাঙছে না। খালের ওপর কোনো বাদুড় সরসর শব্দ তুলছে না। বরং স্টাফ কোয়ার্টারের ওদিক থেকে ভেসে আসছে গুলির আওয়াজ, সাথে অ্যাম্বুলেন্সের হুইসেল, আর মিহি সুরের কান্না। খুব দূরে অথবা নিকটে কেউ যেন বিলাপ করে কাঁদছে। এমন করুণ সুরে কে কাঁদে? আবদুস সালামের মনে হয়, এই কান্না কোনো মানুষের নয়, এই কান্না শহরের, এই ঢাকা শহরের।

পাথরের মূর্তি হয়ে যান আবদুস সালাম। পৃথিবীর কোনো অনুভূতি তাকে স্পর্শ করে না। কখন যে ভোর হয়, সকালের সূর্য ওঠে, বিজিবির দানবীয় চাকা রাস্তায় ঘর্ষণ তোলে, কিছুই টের পান না তিনি। তার ঘোর ভাঙে তখন, যখন দেখেন, একদল শিক্ষার্থী মিছিল করতে করতে ছুটে যাচ্ছে রামপুরার দিকে। অধিকাংশের হাতে বাঁশের লাঠি। লাঠি উঁচিয়ে তারা স্লোগান দিচ্ছে। তাদের স্লোগানগুলোও ভারি অদ্ভুত:

বুকের ভেতর অনেক ঝড়, বুক পেতেছি গুলি কর।
চেয়েছিলাম অধিকার, হয়ে গেলাম রাজাকার।
লেগেছে রে লেগেছে, রক্তে আগুন লেগেছে।
জেগেছে রে জেগেছে, ছাত্রসমাজ জেগেছে।
দিয়েছি তো রক্ত, আরো দেবো রক্ত।

আবদুস সালামের গা শিরশির করে। তার দুই হাত আঁকড়ে ধরে বারান্দার গ্রিল। নড়বড়ে থুতনিটা গ্রিলের ওপর রেখে তিনি দৃষ্টি ছড়িয়ে দেন বাইরে। নতুন খেলনা পেলে শিশুদের চোখে মুখে যে মুগ্ধতা ঝলমলিয়ে ওঠে, একই রকম মুগ্ধতা নিয়ে তাকিয়ে থাকেন অদম্য ছাত্রসমাজের দিকে। না, এই প্রজন্ম সঠিক পথেই আছে। কেউ এদের অধিকার হরণ করতে পারবে না। হঠাৎ এক আফসোস জেগে ওঠে তার মনে। আজ যদি তার তারুণ্য থাকত, তিনিও কি ছুটে যেতেন না ওই মুক্তির মিছিলে! সময় কেন ফুরিয়ে গেল! সময় কেন ফুরিয়ে যায়! বার্ধক্যের হতাশায় কাঁধ ঝুলে পড়ে আবদুস সালামের। গ্লানিতে ভরে ওঠে বুক। এই অবসন্ন শরীর কীভাবে সঙ্গ দেবে মিছিলের। মিছিল কি তাকে সঙ্গে নেবে! অব্যক্ত বেদনার ভারে চোখে জল আসে আবদুস সালামের। চোখ মুছে

তিনি আবার বাইরে তাকান। মিছিলটা ততক্ষণে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। আবদুস সালামের সামনে এখন শুধুই মিছিলের লেজ। তিনি উৎকণ্ঠার সাথে লক্ষ করেন, পেছনের দিকের এই ছেলেগুলোর হাতে কোনো লাঠি নেই। খালি হাতে এরা কীভাবে পথে বের হলো! সরকারের পেটোয়া বাহিনী যদি এদের ওপর আক্রমণ করে! হঠাৎ কী হয় আবদুস সালামের, কাঁপা কাঁপা হাতে চলাফেরার একমাত্র অবলম্বন লাঠিটাকে তিনি শক্ত করে ধরেন। পরম মমতায় আদর বোলান। তারপর বিপ্লবীদের উদ্দেশে গ্রিলের ফাঁক দিয়ে নিচে ফেলে দেন। এক শিক্ষার্থী ব্যালকনির দিকে তাকিয়ে কুড়িয়ে নেয় লাঠিটা। তারপর লাঠিটাকে আকাশপানে উঠিয়ে চিৎকার করে বলে, থ্যাংক ইউ দাদু।

ঘোলা ঘোলা চোখে আবদুস সালাম দেখেন, লাঠি কুড়ানো ছেলেটা আর কেউ নয়, আরিয়ান। ফেনিল আবেগে হৃদয় ঘন হয়ে আসে আবদুস সালামের। বুক থেকে নেমে যায় অপরাধবোধের ভারী পাথর। আজ আর তার কোনো দুঃখ-গ্লানি নেই। আজ তার নাতিটা যুদ্ধে গেছে। সঙ্গে গেছে তার লাঠিটাও।

রচনা : ১৫ আগস্ট, ২০২৪
শব্দঘরে প্রকাশিত

রিকশা কাহিনি

রিকশাওয়ালা মামাকে একটি চায়ের দোকানে বসালাম। জায়গাটা বেশ নিরিবিলি। ঢাকা শহরে এখনো এমন নির্জন জায়গা আছে বিশ্বাস হয় না। দোকানটার মাথার ওপর বকুল গাছের ছাউনি। হঠাৎ দেখলে মনে হয় সবুজ ছাতা। ছাতার নিচে শুয়ে আছে কোমল ছায়া। চোখ ঝলসানো রৌদ্রদিনও বোধহয় এই ছায়াকে হটাতে পারে না। লোকটাকে নিয়ে ঝামেলায় পড়েছি অথচ এই ঝামেলার মাঝেও বকুল গাছ দেখে খানিকটা ভাবালুতায় আচ্ছন্ন হলাম। নয়তো গাছটার ঝাঁকড়া মাথার দিকে তাকিয়ে আছি কেন! না, এটা প্রকৃতি-বিলাসের সময় না। এখন আমার পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া উচিত রিকশাওয়ালা মামার দিকে। তন্বীও খোঁচা মেরে সেটাই যেন বলল। এবার বকুল গাছ ছেড়ে আমি মনোযোগী হলাম রিকশাওয়ালা মামার দিকে। মামা ততক্ষণে বেঞ্চের ওপর পা এলিয়ে বসেছে। খিঁচুনিও কমেছে খানিকটা। এখন তাকে একটু স্বাভাবিক লাগছে। বাঁচা গেল বোধহয়। শুরুতে যা ভয় পেয়েছিলাম না!

অনেক দিন পর আমি আর তন্বী বেরিয়েছিলাম নতুন ঢাকার রাস্তায়। বাসা থেকে বেরোতেই এমন আন্তরিক বাতাস মুখের ওপর আছড়ে পড়ল, মন প্রশান্ত হয়ে উঠল। কী শীতল! কী মায়াময়! তন্বীর দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললামও সেই কথা— দেখছ, কী সুন্দর বাতাস!

তন্বী খানিকটা চিৎকার করেই বলল, স্বাধীন বাংলার বাতাস!

গলি পেরিয়ে বড় রাস্তায় পড়তেই দেখলাম সবকিছু কেমন অচেনা হয়ে গেছে। কোথাও কোনো ব্যানার-ফেস্টুন নেই। কোনো পোস্টার দাঁত কেলিয়ে 'ঈদ মোবারক' জানাচ্ছে না। কোনো বিলবোর্ড বেহায়ার মতো বলছে না অমুক ভাইয়ের চরিত্র ফুলের মতো পবিত্র। আবর্জনা মুক্ত ঢাকা।